ছোটদের

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ছোটদের

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রতীতি

একটি মুক্তির উদ্যোগ প্রয়াস

ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০০৯

প্রকাশক

প্রতীতি

মুক্তির উদ্যোগ
বাড়ি ২৭, সড়ক ৯/এ, ধানমণ্ডি
ঢাকা ১২০৯
E-mail : muktiruddyog@gmail.com

স্বত্ব

মুক্তির উদ্যোগ

অলংকরণ
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
খন্দকার তোফাজ্জল হোসেন

শুভেচ্ছা মূল্য : ২০ টাকা

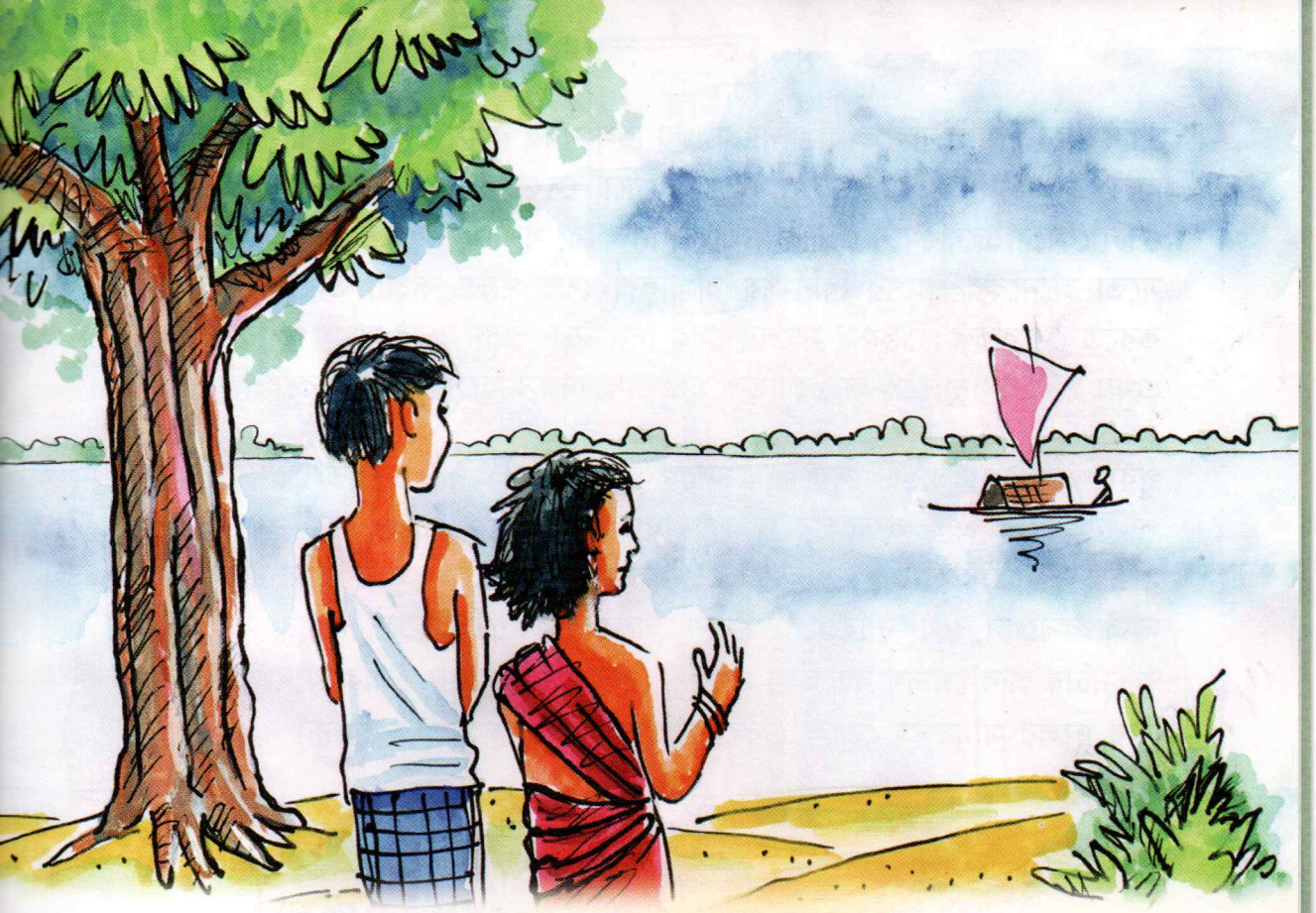

"একসময় আমাদের প্রিয় এই সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান"

আমাদের প্রিয় এই সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের নাম একসময় ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তখন পাকিস্তান দেশটি ছিল খুব বিচিত্র একটি দেশ, কারণ এই দেশের ছিল দুইটি অংশ—একটি অংশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান অন্য অংশটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার, মাঝখানে ছিল অন্য একটি দেশ—সেই দেশটি হচ্ছে ভারত। বাঙালিরা থাকত পূর্ব পাকিস্তানে, তাদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের ভাষা, পোশাক, খাবার বা আচার-আচরণের কোনো মিল ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল অনেক কম, কিন্তু তারাই ছিল শাসক, তাই তারা বাঙালিদের নানাভাবে শোষণ করত। পূর্ব পাকিস্তানে যে টাকা উপার্জন হতো, তার বেশির ভাগ খরচ হতো পশ্চিম পাকিস্তানে।

পাকিস্তানের মিলিটারিতে বাঙালির সংখ্যা ছিল খুবই কম। শুধু তাই না, তারা জোর করে উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাঙালিরা সেটা কোনোভাবে মেনে নেয়নি। আন্দোলন করে, সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের মতো অনেকের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে পেরেছিল। ১৯৫২ সালের সেই দিনটিকে স্মরণ করে সারা পৃথিবীর মানুষ এখন ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে।

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের একজন খুব প্রিয় আর বড়ো নেতা তখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই অত্যাচার আর শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। বঙ্গবন্ধু ছয়দফা নামে ছয়টি দাবি করলেন, যে দাবিগুলো মেনে নিলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সব রকম অত্যাচার আর শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। ছয়দফা আন্দোলন করার জন্যে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর দলের মানুষসহ জেলে ঢুকিয়ে তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করা হলো।

"শুরু থেকেই পাকিস্তান বাঙালিদের নানাভাবে শোষণ করত, এমনকি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৫২ সালে বুকের রক্ত দিয়েছে এ দেশের মানুষ"

"পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ১৯৬৭ সালে বাঙালিরা শুরু করে ৬ দফার আন্দোলন, পতন হয় সামরিক সরকারের"

কিন্তু তবু তিনি পিছালেন না। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে বিশাল একটা আন্দোলনের পর তিনি মুক্ত হয়ে বের হয়ে এলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কথা বিশ্বাস করে তখন পূর্ব পাকিস্তানের সব বাঙালি তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের যে নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনে দুইটি ছাড়া বাকি সব আসনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের দল আওয়ামী লীগ অনেক বেশি ভোট পেয়ে জিতে গেল। যার অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এখন শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, সারা পাকিস্তানের সরকারপ্রধান হবেন।

পাকিস্তানের মিলিটারি শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর তার দলবল সেটি কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। বাঙালিরা পাকিস্তানকে শাসন করবে এটা তারা কল্পনাও করতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে নিয়ে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন হবার কথা ছিল ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে হঠাৎ করে সেটি

বন্ধ করে দেওয়া হলো। খবরটি পৌঁছানোর সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রাস্তায় নেমে আসে। সারাদেশে তখন শুধু মিছিল আর মিছিল—সবার মুখে "জয় বাংলা" স্লোগান। বঙ্গবন্ধু তখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা বাঙালিদের দাবি না মানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কোনো সহযোগিতা করা হবে না। তাঁর মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান পুরোপুরি অচল হয়ে গেল।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা ততদিনে বুঝে গিয়েছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তাদের থাকা আর সম্ভব নয়, তাই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে আন্দোলন শুরু করে দেয়। বাংলাদেশের মানচিত্র বসিয়ে তারা নতুন একটা জাতীয় পতাকা তৈরি করল। "আমার সোনার বাংলা" গানটিকে তারা জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করল। স্বাধীন বাংলাদেশের সেই পতাকা এই দেশের ঘরে ঘরে উড়তে থাকে।

"নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে না পাকিস্তান সরকার, তাই শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে আন্দোলন। বাংলাদেশের মানচিত্র বসিয়ে তৈরি হলো নতুন জাতীয় পতাকা।
'আমার সোনার বাংলা' গানটি হলো
নতুন জাতীয় সংগীত"

"১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রেসকোর্স ময়দানে একটা ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

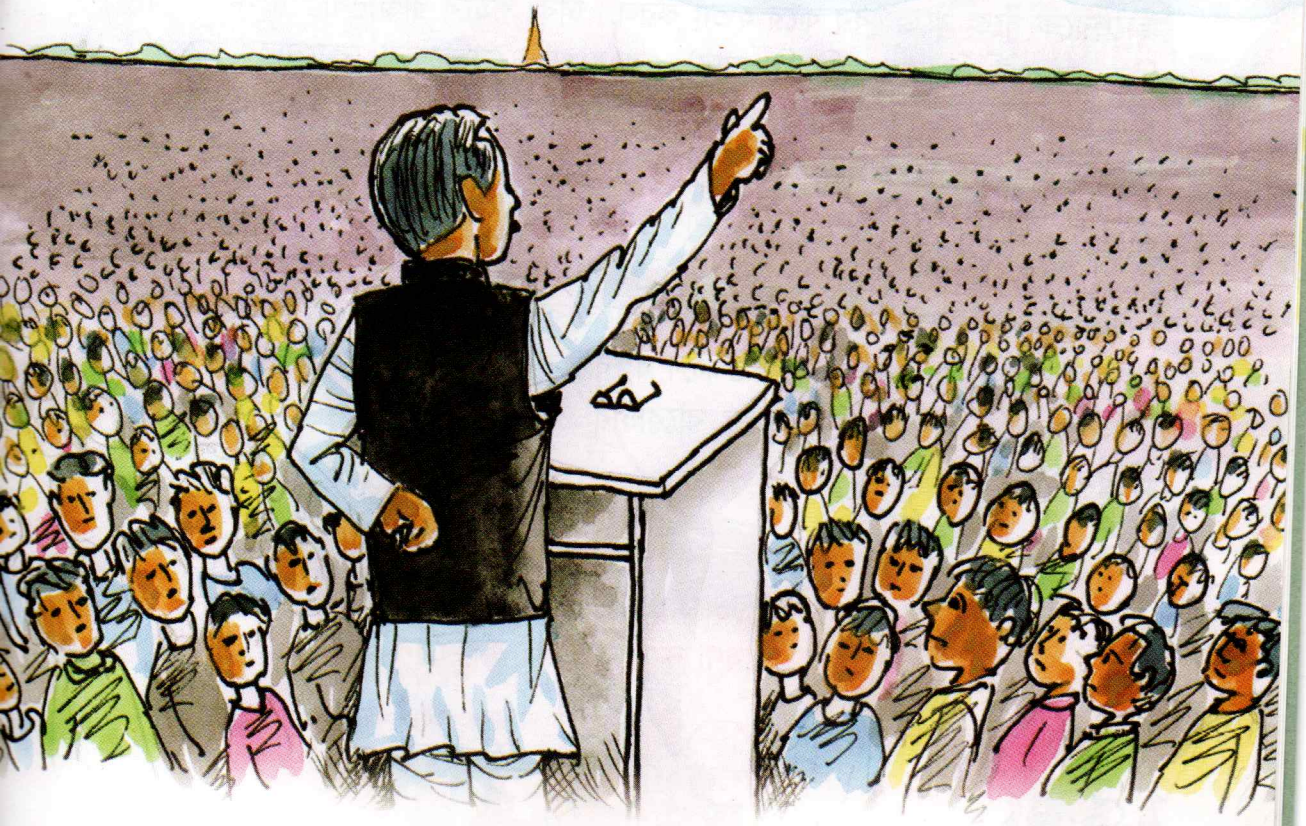

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রেসকোর্স ময়দানে একটা ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই ভাষণ শুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়ে হলেও দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারিরা তখন বসে নেই। তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলার ভান করে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র, কামান, গোলা-বারুদসহ হাজার হাজার মিলিটারি আনতে শুরু করেছে। তারপর ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে ২৫ মার্চ গভীর রাতে তারা বাংলাদেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই রাতে পাকিস্তানের মিলিটারিরা ঢাকা শহরে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল। দালান কোঠা গুঁড়িয়ে দিয়ে তারা বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। যারা পালানোর চেষ্টা

করল মেশিনগানের গুলি দিয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করল। পাকিস্তানি মিলিটারির রাগ সবচেয়ে বেশি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর, তাই তারা তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করল। ঢাকা শহরে রাজারবাগের পুলিশ আর পিলখানায় ই পি আর (বি ডি আর)-এর বাঙালি সৈনিকেরা কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই পাকিস্তানি মিলিটারির সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করে গেল। কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারিরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি, শুধু তাই না, তাদের কাছে ছিল ভারী অস্ত্র, কামান, গোলা বারুদ আর ট্যাংক, তাই শেষ পর্যন্ত তারা টিকে থাকতে পারল না।

পাকিস্তানি মিলিটারি কমান্ডোরা ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসায় আক্রমণ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, কিন্তু ততক্ষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। সেই ঘোষণা প্রচারিত হলো রাত বারোটার পর, সেই জন্যে আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।

"২৫ মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালিদের ওপর, শুরু করে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করে ২৬ মার্চ জন্ম দেন বাংলাদেশের"

"পাকিস্তানি মিলিটারিদের সাথে যোগ দেয় রাজাকার, আল-বদর আর আল-শামস নামে কিছু দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। নয় মাসে তাদের হাতে প্রাণ হারায় এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ"

পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারিরা বাঙালি মিলিটারিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের হয় বন্দি, না হয় হত্যা করার চেষ্টা করল। অসংখ্য বাঙালি মিলিটারি মারা গেলেন, আর যাঁরা পারলেন তাঁরা বীরের মতো যুদ্ধ করে পাকিস্তান মিলিটারির ঘাঁটি থেকে বের হয়ে গেলেন। ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আবার স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করলেন। পাকিস্তান মিলিটারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীর সাথে যোগ দিল এই দেশের সাধারণ ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক সবাই। কিন্তু বাঙালিরা তখন সশস্ত্রযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাদের অস্ত্রশস্ত্র নেই, যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের মিলিটারিরা সারা বাংলাদেশকে মোটামুটিভাবে দখল করে নিল। তারপর তারা শুরু করল এক ভয়ঙ্কর গণহত্যা, অত্যাচার আর নির্যাতন।

পাকিস্তানের মিলিটারিদের সাথে তখন এই দেশের কিছু বিশ্বাসঘাতক মানুষ যোগ দেয়, তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ছিল জামায়াতে ইসলামী দলের সদস্য। তারা রাজাকার, আল-বদর আর আল-শামস বাহিনী তৈরি করে পাকিস্তান মিলিটারির পাশাপাশি থেকে এই দেশের মানুষের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করে দেয়। এই দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পাশের দেশ ভারতে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নেয়। ভারত তাদেরকে আশ্রয় দিলেও এতগুলো মানুষ হঠাৎ করে হাজির হওয়াতে তাদের জন্যে না ছিল থাকার জায়গা, না ছিল খাবারদাবার বা চিকিৎসার ব্যবস্থা। অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে মারা গিয়েছিল—যাদের বেশির ভাগই ছিল শিশু।

"প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ৭ কোটি মানুষের এই দেশ থেকে এক কোটি মানুষই শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নেয় পাশের দেশ ভারতে"

"গর্জে ওঠে পুরো দেশ, শুরু হয় গণযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এই দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানি মিলিটারি গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে, তাই তখন দেশের হাল ধরতে এগিয়ে এলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। দেশের সব নেতাকে একত্র করে ১০ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ সরকার গঠন করলেন। সেই সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে মুক্ত করার যুদ্ধ শুরু হলো। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব নিলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। নিয়মিত সশস্ত্রবাহিনী যখন সামনাসামনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিল মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা তখন পিছন থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

সারাদেশকে এগারোটা সেক্টরে ভাগ করে নতুন উৎসাহে যুদ্ধ শুরু হলো। সেই যুদ্ধে যোগ দিল এই দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক, যোগ দিল নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যোগ দিল পাহাড়ি আর আদিবাসী। যারা সরাসরি যুদ্ধ করছিল না, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে সাহায্য করতে থাকে।

স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে, যুদ্ধের খবর প্রচার করে দেশের মানুষদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। যাঁরা দেশের বাইরে ছিলেন, তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে বিদেশে জনমত তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করলেন। পৃথিবীর বড়ো বড়ো গায়ক কনসার্টে গান গাইলেন, কবিরা কবিতা লিখলেন এবং এভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এগিয়ে আসতে থাকেন।

প্রথম দিকে গেরিলাদের অভিজ্ঞতা ছিল কম, ধীরে ধীরে তাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে আর তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। তারা জীবনপণ যুদ্ধ শুরু করে। তাদের বেশিরভাগই ছিল কম বয়সী তরুণ, কিন্তু কী ভয়ানক তাদের সাহস, দেশের জন্যে কী গভীর তাদের ভালোবাসা! তাদের আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। গেরিলা আক্রমণের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতিশোধ নিত আশপাশের সব গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে আর সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। কিন্তু গেরিলা আক্রমণ থেমে থাকল না, চলতেই থাকল। ধীরে ধীরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এমন অবস্থা হলো যে তারা তাদের ঘাঁটি থেকে বের হতেই সাহস পেত না। নিজেদের বাংকারে বসে থেকে তারা কোনোমতে তাদের জান

"মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর।
যোগ দেয় পাহাড়ি আর আদিবাসী"

"পাকিস্তানের আক্রমণের জবাব দিতে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেয় ভারতীয় বাহিনী। যৌথবাহিনীর সাথে যুদ্ধে মাত্র তেরো দিনেই পরাজিত হয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে"

বাঁচাতে চেষ্টা করত। আস্তে আস্তে পাকিস্তানিরা বুঝে গেল যে এই যুদ্ধে তারা হেরে যাবে। যেহেতু ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করেছে, এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, তাই তাদের রাগটাও বেশি ছিল ভারতের ওপর। সেজন্যে ডিসেম্বরের ৩ তারিখ ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে ভারত আক্রমণ করে বসে। ভারত তখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করল আর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিল মিত্রবাহিনী হিসেবে—দুই বাহিনী মিলে তৈরি হলো যৌথবাহিনী।

গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে এত দুর্বল আর আতঙ্কিত করে রেখেছিল যে, যখন মুক্তিবাহিনীকে নিয়ে ভারতের মিত্রবাহিনী যুদ্ধ শুরু করল, তখন তারা কোনোরকমে ২ সপ্তাহও টিকে থাকতে পারল না। মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনী পাকিস্তানিদের পরাজিত করে ঢাকা শহরকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। পাকিস্তানি মিলিটারি যখন দেখল তাদের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই, তখন তারা প্রায় এক লক্ষ সেনাসদস্য নিয়ে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করল। সেই দিনটি ছিল ১৬ ডিসেম্বর, তাই ১৬ ডিসেম্বর হচ্ছে আমাদের বিজয় দিবস।

"২৬ মার্চ যে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৬ ডিসেম্বর সেটা অর্জন করা হয় বিজয়ের ভেতর দিয়ে। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে থাকে বাংলাদেশের আকাশে"

"যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আল-বদর বাহিনী এই দেশের শত শত শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিককে বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে"

আমাদের দেশের ভিতরে ঘাপটি মেরে বসেছিল কিছু দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। তারা বুঝতে পারল পাকিস্তানি মিলিটারি যুদ্ধে হেরে যাবে, জন্ম নেবে স্বাধীন বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশ যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই জন্যে আল-বদর বাহিনী এই দেশের শত শত শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছিল। এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই, বাংলাদেশের মানুষ এই মানুষগুলোকে কোনোদিন ক্ষমা করেনি। কোনোদিন ক্ষমা করবেও না।

একটি দুটি নয়, ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, আবার অনেক কিছু পাইনি। যা কিছু পাইনি সেগুলো পাওয়ার জন্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা স্বপ্ন দেখি একদিন ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ, পাহাড়ি-আদিবাসী সবাই মিলে আমাদের প্রিয় এই দেশটাকে আমরা গড়ে তুলব।

যে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছিলেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, ভালোবাসারও শেষ নেই। আমরা তাঁদের সাতজনকে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মান জানিয়েছি। আরো অল্প কয়েকজনকে পদক দিয়ে সম্মানিত করেছি, কিন্তু তার বাইরেও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা রয়ে গেছেন, যাঁদের জন্যে আমরা কিছু করতে পারিনি। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে তাঁদের হাত স্পর্শ করে আমাদের বলতে হবে, একটা স্বাধীন দেশ এনে দেওয়ার জন্যে তোমাদের প্রতি ভালোবাসা এবং ভালোবাসা। তাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে, আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি— তোমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলে আমরা সেই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব। তোমাদের রক্তের ঋণ আমরা শোধ করবই করব।

"মুক্তিযোদ্ধারা এই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের হাত স্পর্শ করে বলতে হবে, আমরা এই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব। তোমাদের রক্তের ঋণ আমরা শোধ করবই করব"

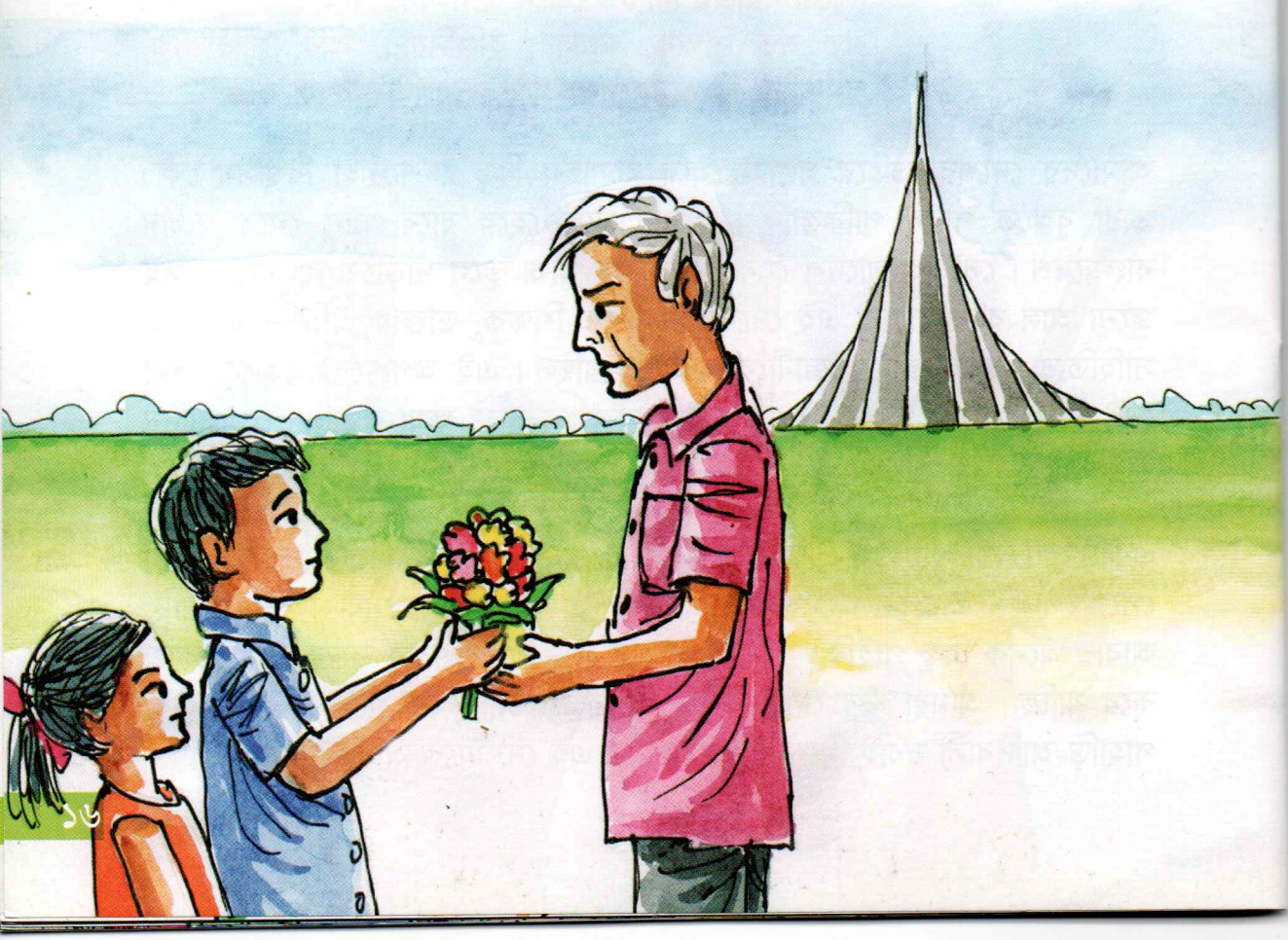

ছোটদের
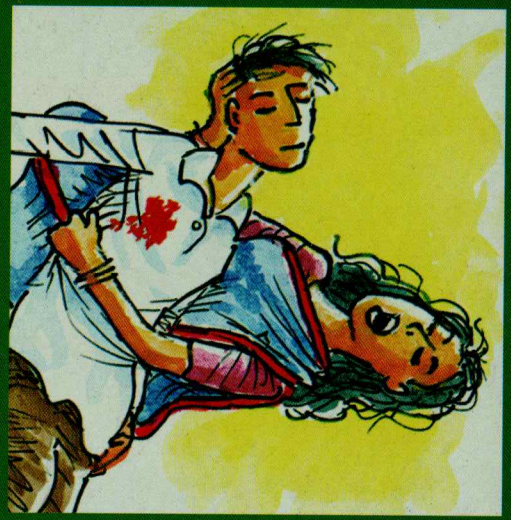
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস